

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআনি শিক্ষা থেকে দূর থাকার সামাজিক ও নৈতিক ক্ষতিঃ

একটি পর্যালোচনা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রোজিনা আক্তার

রোলঃ ২৩১০০১২১৭২৭

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআনি শিক্ষা থেকে দূর থাকার সামাজিক ও নৈতিক ক্ষতি:

একটি পর্যালোচনা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক

স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রোজিনা আক্তার

রোলঃ ২৩১০০১২১৭২৭

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ কুরআনি শিক্ষা থেকে দূর থাকার সামাজিক ও নৈতিক ক্ষতি: একটি পর্যালোচনা ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রোজিনা আক্তার, আইডিঃ ২৩১০০১২১৭২৭ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওঃ আলী হাসান

তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ কুরআনি শিক্ষা থেকে দূর থাকার সামাজিক ও নৈতিক ক্ষতি: একটি পর্যালোচনা ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Rozina Akter

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

রোজিনা আক্তার

৩১ মে, ২০২৬ ইং

আইডিঃ ২৩১০০১২১৭২৭

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

১ ভূমিকাঃ.....	5
২ কুরআনিক শিক্ষা পরিচিতিঃ.....	8
৩ কুরআনি শিক্ষা বর্জনের নৈতিক ও আত্মিক ক্ষতিঃ.....	11
৪. নৈতিক অবক্ষয় ও মানবতার স্থলন.....	18
৫. পারিবারিক কাঠামোর ভাঙন ও অবক্ষয়	22
৬. সামাজিক সংকট, অর্থনৈতিক অনাচার ও বিশৃঙ্খলা	24
৭. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও বিচারিক স্থলন.....	27
৮ কুরআনি শিক্ষা ও নৈতিকতা থেকে বিচ্যুত হওয়া সমাজের পতন	28
৯ কুরআনি শিক্ষাভিত্তিক সমাজ বনাম কুরআন-বিচ্যুত সমাজ	29
১০. কুরআনিক শিক্ষার আলোকে উত্তরণের উপায়.....	31
১১ উপসংহার.....	33

১ ভূমিকাঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

মুসলমানদের জন্য পথনির্দেশনার চূড়ান্ত উৎস আল কুরআন। আল কুরআন আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ যা একই সাথে একটি ধর্মীয় গ্রন্থ, এবং একটি অর্থবহ ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ নির্দেশিকা। আল কুরআনের শিক্ষা মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ কীভাবে মোকাবিলা করতে হয়, কীভাবে উত্তম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় এবং কীভাবে আল্লাহর সাথে একটি সুদৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়, তা বুঝতে সহায়তা করে। আল কুরআনের প্রতিটি আয়াতে এমন প্রজ্ঞা নিহিত রয়েছে, যা একজন ব্যক্তির চরিত্র গঠন করতে এবং তার জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সক্ষম।

আল কুরআনের শিক্ষা যেমনঃ সর্ব অবস্থায় আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল, বিপদে ধৈর্য ধারণ, সবসময় আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন ইত্যাদি বান্দাদের ঈমান, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়ে সঠিক ভাবে জীবন যাপনে সহায়তা করে। কুরআনিক শিক্ষার মূল ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ বা মহান স্রষ্টা আল্লাহর একত্ববাদ। মানবজাতির জন্য কল্যাণের সকল শাখাই এই তাওহীদের ভিত্তিতে গড়ে উঠে, কারণ তাওহীদ-বিরোধী যেকোনো কিছুই মানবকল্যাণের প্রকৃত নিয়ামক বা শিক্ষার বিষয় হতে পারে না। কুরআনিক শিক্ষা মানুষের ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন করে, স্রষ্টার বিধিনিষেধ মেনে চলতে সহায়তা করে এবং পাশবিক প্রবৃত্তি থেকে মানুষকে মুক্তি দিয়ে ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তির পথ প্রশস্ত করেশ। মানবজীবনের এই সামগ্রিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য আল্লাহ তাআলা আল-কুরআনকে একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধান, সংবিধান এবং দিকনির্দেশিকা হিসেবে অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ রব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে বলেন,

“হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ করো এবং তাঁর পথে জিহাদ করো...” (আল-মায়িদাহ: ৩৫)।

আল্লাহই হলেন পথপ্রদর্শক, ‘আল-হাদী’; আর মহিমাম্বিত কুরআনিক শিক্ষা হলো ‘হিদায়াহ’ বা ঐশী পথনির্দেশনা। মহিমাম্বিত কুরআনে আল্লাহ বলেন:

“আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট হতে দেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয়, তাকে সঠিক পথের দিশা দেন” (আর-রা’দ: ২৭)।

যে বান্দারা আল্লাহর অনুগত, আত্মসমর্পণকারী এবং সঠিক পথের সন্ধানপ্রত্যাশী, আল্লাহ তাদের সঠিক পথপ্রদর্শন করেন। আল্লাহ বলেন,

“যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তিনি তার হৃদয়কে সঠিক পথের দিশা দেন” (আত-তাগাবুন: ১১)।

বিপরীতভাবে আল কুরআন থেকে দূরে থাকা বান্দাদের করে চরমভাবে পথভ্রষ্ট। কুরআনি শিক্ষা থেকে দূরে থাকা বান্দারা ব্যক্তিগত জীবনে যেমন নৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়, তেমনি সামাজিক জীবনে হয় বিপর্যয়ের শিকার। আমরা যদি সমসাময়িক বিশ্বব্যবস্থা এবং সমাজকাঠামোর দিকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাব যে, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা বস্তুগত ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ওপর মাত্রাতিরিক্ত জোর দিলেও আত্মিক, নৈতিক ও পারলৌকিক শিক্ষার চরম অভাব সেখানে প্রকট। কুরআনি শিক্ষা থেকে মানুষের এই ক্রমাগত দূরত্বের কারণে সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বব্যাপী এক ভয়াবহ নৈতিক অবক্ষয়, মনস্তাত্ত্বিক শূন্যতা এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে। কুরআন থেকে এই বিচ্যুত হওয়া বর্জন কেবল কুরআন তিলাওয়াত না করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রতিটি স্তরে কুরআনের আদর্শকে এড়িয়ে চলার সামগ্রিক প্রবণতাকে নির্দেশ করে। যারা আল্লাহর অবাধ্য, তাদের নিজস্ব অবস্থার ওপরই ছেড়ে দেওয়া হয়। আল্লাহ কুরআনে বলেন:

“আল্লাহ পাপী সম্প্রদায়কে সঠিক পথের দিশা দেন না” (আল-মুনাফিকুন: ৬)।

অন্য একটি আয়াতে বলা হয়েছে:

“আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট হতে দেন এবং যাকে ইচ্ছা সঠিক পথের দিশা দেন” (ইবরাহিম: ৪)। এই গবেষণামূলক পর্যালোচনায় কুরআনি শিক্ষা থেকে দূরে থাকার

কারণে সৃষ্ট আর্থিক, নৈতিক, এবং সামাজিক ক্ষতির একটি বিশদ ও গভীর পর্যালোচনা
উপস্থাপন করা হয়েছে।

২ কুরআনিক শিক্ষা পরিচিতিঃ

সাধারণত কুরআনি শিক্ষা বলতে কুরআন শরীফ পাঠ, অর্থাৎ আরবি উচ্চারণে সঠিকভাবে কুরআন তেলাওয়াত ও হিফজ, এবং কোরআনের শিক্ষা এবং তার জীবন দর্শন, নৈতিক আদর্শ ও বিধি বোঝার প্রক্রিয়াকে বোঝায়। কুরআনের শিক্ষা কেবল ব্যাকরণগতভাবে আরবি কুরআন পড়া নয়, বরং এর মধ্যে কুরআনের বাণী শেখা, বোঝা এবং জীবনে প্রয়োগ করা অন্তর্ভুক্ত। ইসলাম ধর্মে জ্ঞান অর্জন ও শিক্ষা প্রদানের গুরুত্বসহকারে উল্লেখ আছে। সর্বপ্রথম অবতরণকৃত আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন

“পড়, তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন” (সূরা আল-আলাকঃ ১)। এই আয়াতে আল্লাহ প্রথম নির্দেশ দিয়েছেন ‘পড়ো’ শব্দটির মাধ্যমে। এই আয়াতের মাধ্যমে আমরা অনুধাবন করতে পারি কুরআনিক শিক্ষা গ্রহণের সর্বোচ্চ গুরুত্ব। একইভাবে আল-বাকারাহ সূরার ২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে:

“এই সেই কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই; মুত্তাকীদের জন্য এটি পথপ্রদর্শন” (সূরা বাকারাহঃ ২)।

এই আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে, কুরআন হলো অসন্দেহিত আল্লাহর বাণী যা তাকওয়া (ভীতির) মানুষকে পথ দেখায়। এর ফলে কুরআনী শিক্ষার গুরুত্ব এবং এর প্রতি অব্যক্ত সম্মান স্পষ্ট হয়।

ঐতিহাসিকভাবে মুসলিম সভ্যতায় কুরআনী শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আওলিয়া স্থাপিত প্রথম কওমি মাদ্রাসাগুলি এবং পরবর্তীতে ব্রিটিশ অধিকারে এলিয়ার প্রতিষ্ঠা মূলত ইসলামী শিক্ষাকে প্রসারিত করেছিল। এইধরনের উদাহরণ নির্দেশ করে যে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কুরআন শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়ার প্রেক্ষাপট ছিল। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশসহ অনেক মুসলিম দেশে শিক্ষানীতি ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবণতায় পরিবর্তিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে স্পষ্টভাবে ইসলাম ও নৈতিক

শিক্ষার গুরুত্ব উল্লেখ ছিল, কিন্তু ২০১২ সালে প্রণীত জাতীয় পাঠ্যক্রমে ইসলামি শিক্ষা কেবল ঐচ্ছিক করা হয় এবং ধর্মীয় বিষয়গুলো পরীক্ষার পাঠ্যক্রম থেকে বাদ দেয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই ধরনের পরিবর্তন পারস্পরিক মূল্যবোধের শূন্যতা তৈরির অন্যতম কারণ বলে বিবেচিত।

২.১ আল কুরআনের আলোকে কুরআনিক শিক্ষা পরিত্যাগের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বিশ্লেষণঃ

কুরআনি শিক্ষা থেকে দূরে থাকার বিষয়টিকে আল-কুরআনের আল্লাহ তাআলা সূরা আল-ফুরকানে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচনা করেছেন। কিয়ামতের দিন, যখন মানব জাতির শেষ বিচার অনুষ্ঠিত হবে, তখন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর উম্মতের বিরুদ্ধে একটি ভয়ানক অভিযোগ দায়ের করবেন। এই অভিযোগটি কুরআনিক শিক্ষা পরিত্যাগের পরিত্যাগ করার জন্য। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন, "আর রাসূল বলবে, 'হে আমার রব, নিশ্চয় আমার সম্প্রদায় এ কুরআনকে পরিত্যাজ্য (মাহজুর) গণ্য করেছে।'" (সূরা আল-ফুরকান, ২৫:৩০)।

উক্ত আয়াতের তাফসীরে মুফাসসিরগণ 'পরিত্যাজ্য' বা 'মাহজুর' শব্দের ব্যাপক অর্থ ও প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে দেখা যায়, মক্কার মুশরিকরা কুরআন পাঠের সময় প্রবল হৈ-হুল্লোড় ও শোরগোল করত যেন সত্যের বাণী মানুষের কানে না পৌঁছায় এবং কেউ তা শুনতে না পায়, এটি ছিল এক প্রকার বর্জন। আধুনিক যুগে আমরা এই হৈ-হুল্লোড়ের ভিন্ন ধরন দেখতে পাই। অধিকাংশ মানুষ এখন গান-বাজনা, পার্শ্ববিনোদন এবং বস্তুবাদী মগ্নতায় নিমজ্জিত। কুরআনের বাণী শোনার বা অনুধাবন করার সময় যেনো তাদের নেই। কুরআনের প্রতি ঈমান না আনা এবং সেই অনুযায়ী আমল না করাও কুরআন বর্জনের নামান্তর। একইসাথে কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা-গবেষণা না করা, তার আদেশাবলি পালন না করা ও তার নিষেধাজ্ঞাবলি হতে বিরত না থাকাও এক প্রকার কুরআন ছেড়ে দেওয়ার শামিল।

২.২ কুরআনিক শিক্ষা পরিত্যাগের শ্রেণিবিন্যাসঃ

কুরআনিক শিক্ষা পরিত্যাগের বিষয়টিকে কয়েকটি শ্রেণিতে আলোচনা করা যায়। নিচে কুরআনিক শিক্ষা বর্জন এবং এর আত্মিক, নৈতিক, এবং সামাজিক ক্ষতির প্রভাব উপস্থাপন করা হলো :

শ্রবণ ও মনোযোগ পরিত্যাগঃ কুরআন মনোযোগ সহকারে না শোনা এবং এর প্রতি সম্পূর্ণরূপে ভ্রক্ষেপ না করা। এর ফলে মানুষের অন্তরে কুরআনের প্রতি কোনো ঐশী আকর্ষণ, শ্রদ্ধাবোধ বা অনুশোচনা তৈরি হয় না। মানুষ বস্তুবাদী কোলাহলের মাঝে ঐশী সুর শুনতে ব্যর্থ হয়।

আমল বা বাস্তবায়ন পরিত্যাগঃ কুরআনের হালাল ও হারামকে ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনে মেনে না চলা। কুরআনকে কেবল বরকতের জন্য পড়া হলেও এর বিধানকে জীবনঘনিষ্ঠ বা অবশ্য পালনীয় মনে না করা। এটি এক ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতারনার জন্ম দেয়।

বিচার ও ফয়সালা পরিত্যাগঃ জীবনের মৌলিক আকীদা এবং শাখাগত দ্বন্দ্বিক বিষয়ে কুরআনের মাধ্যমে ফয়সালা বা বিচার না করা। এর পরিবর্তে মানুষের মনগড়া মানবসৃষ্ট মতবাদের আশ্রয় নেওয়া। এটি সমাজে চরম রাজনৈতিক ও আইনি অস্থিতিশীলতা তৈরি করে।

অনুধাবন ও গবেষণা পরিত্যাগঃ মহান আল্লাহ এই কিতাবের মাধ্যমে কী বার্তা দিতে চাচ্ছেন, তার গভীরভাবে বুঝার চেষ্টা না করা। কুরআনকে কেবল না বুঝে আক্ষরিক পাঠের বস্তুতে পরিণত করা। ফলে সমাজ কুরআনের প্রজ্ঞাপূর্ণ দিকনির্দেশনা থেকে বঞ্চিত হয়।

আত্মিক চিকিৎসার মাধ্যম হিসেবে পরিত্যাগঃ অন্তরের নানাবিধ রোগ যেমন: অহংকার, লোভ, সন্দেহ, হতাশা, বিষণ্ণতা নিরাময়ে কুরআনের কাছে আরোগ্য না খোঁজা। মানুষ যখন আধ্যাত্মিক সংকটে পড়ে, তখন ঐশী বাণীর পরিবর্তে জাগতিক থেরাপি বা বস্তুবাদী চিন্তার ওপর নির্ভরশীল হওয়া।

এই পাঁচ প্রকার পরিত্যাগের যেকোনো একটিতে লিপ্ত হলে, ব্যক্তি বা সমাজ নিজেকে স্বপ্রণোদিত হয়ে কুরআনি শিক্ষার সুফল থেকে বঞ্চিত করছে। এর পরিণতি হিসেবে সমাজদেহে নানাবিধ মনস্তাত্ত্বিক, আত্মিক ও সামাজিক ব্যাধি বাসা বাঁধে, যা সামগ্রিক কাঠামোর পতনকে ত্বরান্বিত করে।

৩ কুরআনি শিক্ষা বর্জনের নৈতিক ও আত্মিক ক্ষতি:

মানুষের নৈতিক এবং আত্মার সুস্থতা সরাসরি আল্লাহর সাথে স্থাপিত সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল। কুরআনি শিক্ষা মানুষকে এই সম্পর্কের সঠিক রূপরেখা প্রদান করে এবং তাকে অস্তিত্বের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন করে। যখন কোনো মানুষ বা সমাজ এই শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তখন তার প্রথম ও সবচেয়ে ভয়াবহ নেতিবাচক প্রভাবটি পড়ে তার মানসিক এবং আত্মিক অবস্থার ওপর।

৩.১ জীবন-সংকীর্ণতার অভিশাপ

কুরআনি শিক্ষা থেকে বিমুখতার ফলে সৃষ্ট মনস্তাত্ত্বিক যন্ত্রণা ও জাগতিক হতাশার কথা আল-কুরআনে স্পষ্টভাবে ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। সূরা ত্বহায় মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন:

"আর যে আমার স্মরণ (কুরআন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা হবে সংকীর্ণ এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।" (সূরা ত্বহা, :১২৪) । এই আয়াতের তাফসীরে ইবনে কাসীরের বর্ণনানুযায়ী, এখানে 'সংকীর্ণ জীবন' বলতে কেবল অর্থনৈতিক দারিদ্র্য বা সম্পদের অভাবকে বোঝানো হয়নি। বরং এর গূঢ় অর্থ হলো, সে দুনিয়ার জীবনে কখনো অন্তরের প্রকৃত প্রশান্তি লাভ করবে না। তার কাছে যত বিপুল ধন-সম্পদই সঞ্চিত থাকুক না কেন, অল্পে তৃপ্তির মহৎ গুণ তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে এবং তার সাংসারিক লোভ-লালসা বহুগুণে বাড়িয়ে দেওয়া হবে। ফলে সর্বদা এক অজানা অস্থিরতা, অতৃপ্তি ও মানসিক শূন্যতা তাকে তাড়িয়ে বেড়াবে। হাদিসের ভাষ্যমতে, এই সংকীর্ণতা কেবল দুনিয়াতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং কবরের জীবনেও তাকে এমনভাবে চেপে ধরা হবে যে, তার এক পাঁজরের হাড় অপর পাঁজরের ভেতর ঢুকে যাবে। আধুনিক যুগে মনস্তাত্ত্বিক বিষণ্ণতা, ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন এবং উন্নত বিশ্বে আত্মহত্যার উচ্চহার এই 'সংকীর্ণ জীবনের' একটি বাস্তব প্রতিচ্ছবি। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রদর্শিত পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার ফলে মানুষের জীবন লক্ষ্যহীন হয়ে পড়ে। বস্তুবাদী অর্জন বা ক্যারিয়ারের চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছেও মানুষ অনুভব করে এক ভয়ংকর শূন্যতা, কারণ আল্লাহর স্মরণ ব্যতীত আত্মা কখনোই প্রশান্ত হতে পারে না।

৩.২. অন্তঃসংকীর্ণতা ও সত্য গ্রহণে অনীহা

কুরআনি শিক্ষা মানুষের অন্তরকে প্রশস্ত করে, চিন্তা প্রসারিত করে এবং সত্য ধারণের উপযোগী করে তোলে। কিন্তু যারা এর থেকে অহংকারবশত দূরে থাকে, তাদের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার এক বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সূরা আল-আনআমে:

"সুতরাং যাকে আল্লাহ হিদায়াত করতে চান, ইসলামের জন্য তার বুক উন্মুক্ত করে দেন। আর যাকে ভ্রষ্ট করতে চান, তার বুক সঙ্কীর্ণ-সঙ্কুচিত করে দেন, যেন সে আসমায়ে আরোহণ করেছে। এমনভাবে আল্লাহ অকল্যাণ দেন তাদের ওপর, যারা ঈমান আনে না।" (সূরা আল-আনআমঃ ১২৫) ।

এই আয়াতের মনস্তাত্ত্বিক রূপকটি অভাবনীয়। আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, মহাশূন্য বা আকাশে যতই ওপরে ওঠা যায়, অক্সিজেনের অভাবে মানুষের জন্য শ্বাস নেওয়া ততই কঠিন ও কষ্টসাধ্য হতে থাকে এবং বুক মারাত্মকভাবে সংকুচিত হয়ে আসে। ঠিক তেমনি, কুরআনি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত অহংকারী ও পথভ্রষ্ট অন্তরের জন্য সত্য গ্রহণ করা এবং একটি পবিত্র, নৈতিক জীবনযাপন করা অত্যন্ত কষ্টদায়ক ও দমবন্ধ করা বিষয় বলে মনে হয় ।

তাফসীরবিদদের মতে, বক্ষ উন্মুক্ত করার অর্থ হলো তাওহীদ ও ঈমানের জন্য তা প্রশস্ত হওয়া এবং সত্যকে গ্রহণ করার মানসিকতা তৈরি হওয়া । অন্যদিকে, বক্ষ সংকীর্ণ হওয়ার অর্থ হলো অন্তর কঠিন ও দুর্ভেদ্য হয়ে যাওয়া। সাহাবায় কেরামের মতে, মুনাফিকের অন্তর হলো এই সংকীর্ণ বক্ষের অনুরূপ, যেখানে কোনো কল্যাণকর চিন্তা প্রবেশ করতে পারে না। বর্তমান বিশ্ব এই ধরনের সন্দেহ, সংশয় ও নাস্তিক্যবাদী দর্শনের আবর্তে নিপতিত। কুরআনি শিক্ষার অভাবই মানুষের অন্তর থেকে সেই নূর বা আলো কেড়ে নিয়েছে, যা দিয়ে সে স্রষ্টার নিদর্শনাবলি উপলব্ধি করতে পারত।

৩.৩ শয়তানের নিরবচ্ছিন্ন সাহচর্য ও পাপাচারের বিস্তৃতি

মানুষ যখন কুরআনিক জ্ঞান থেকে দূরে সরে যায়, তখন তার চিন্তার জগতে একটি শূন্যতা তৈরি হয়। প্রকৃতি শূন্যতা পছন্দ করে না, তাই এই শূন্যস্থান দখল করে শয়তানের কুমন্ত্রণা। আল-কুরআনের সূরা যুখরুফে চমৎকার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে:

"আর যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর যিকির (স্মরণ ও বিধান) থেকে অন্ধ হয়ে যাবে, তার জন্য আমি নিয়োজিত করি এক শয়তান, যে তার সার্বক্ষণিক সঙ্গী (ক্লারিন) হয়ে যায়।" (সূরা যুখরুফ :৩৬) ।

'ক্লারিন' বা সঙ্গী শয়তানের মূল কাজ হলো মানুষকে ধীরে ধীরে এবং অত্যন্ত সুকৌশলে পথভ্রষ্ট করা। সে অন্যায়, অশ্লীল ও কুকর্মকে মানুষের চোখে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলে এবং ভালো কাজে প্রবল বাধা প্রদান করে। কুরআনি শিক্ষার অভাব ব্যক্তিকে এই শয়তানি প্ররোচনার বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ প্রতিরক্ষাহীন করে তোলে। ফলে ব্যক্তি ধীরে ধীরে পাপকাজে এতটাই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে যে, তার মধ্যকার অপরাধবোধ বা 'বিবেকের দংশন' সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়। সে মনে করে সে সঠিক পথেই আছে, অথচ সে ধ্বংসের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে।

৩.৪ কুরআনি শিক্ষা থেকে দূরে থাকার ব্যক্তিগত ক্ষতি

মানুষের ব্যক্তিগত জীবন গঠন, চরিত্র নির্মাণ এবং আত্মিক বিকাশে কুরআনের ভূমিকা অপরিসীম। কুরআন কেবল একটি ধর্মীয় গ্রন্থ নয়; বরং এটি মানবজীবনের পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা। যখন একজন ব্যক্তি কুরআনের শিক্ষা থেকে দূরে সরে যায়, তখন তার চিন্তাধারা, নৈতিকতা, আত্মিক অবস্থা এবং জীবনদর্শনে গভীর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে এই ক্ষতিগুলো ধীরে ধীরে পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের ওপরও প্রভাব বিস্তার করে।

৩.৪.১ আত্মিক শূন্যতা ও মানসিক অস্থিরতাঃ আত্মিক শূন্যতা বলতে এমন একটি অবস্থাকে বোঝায় যেখানে মানুষ জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। বাহ্যিকভাবে সে সফল, ধনী বা সম্মানিত হলেও অন্তরে এক ধরনের অপূর্ণতা ও অশান্তি অনুভব করে। কুরআন মানুষকে শিক্ষা দেয়

"আমি জিন ও মানুষকে শুধু আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।" (সূরা আয-যারিয়াত:৫৬)

এই আয়াত অনুযায়ী মানুষের সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদত। যখন মানুষ এই উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়, তখন তার জীবনে অর্থহীনতা ও শূন্যতার অনুভূতি সৃষ্টি হয়।

কুরআন মানুষের হৃদয়ের প্রশান্তির একমাত্র উৎস হিসেবে আল্লাহর স্মরণকে ঘোষণা করেছে।

"জেনে রাখ! আল্লাহর স্মরণেই হৃদয়সমূহ প্রশান্তি লাভ করে।" (সূরা আর-রা'দ:২৮)
এই আয়াত মানবজীবনের এক মৌলিক সত্যকে তুলে ধরে। মানুষের হৃদয়ের প্রকৃত প্রশান্তি ধন-সম্পদ, ক্ষমতা বা পার্থিব ভোগ-বিলাসে নয়; বরং আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর নির্দেশনার অনুসরণে নিহিত।

কুরআনি শিক্ষা থেকে দূরে গেলে মানুষ বস্তুবাদে নিমজ্জিত হয়। তার জীবনের উদ্দেশ্য অস্পষ্ট হয়ে পড়ে এবং সে হতাশা, উদ্বেগ ও অস্তিত্ব সংকটে আক্রান্ত হয়। বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তিগত উন্নতি সত্ত্বেও বিষণ্ণতা, আত্মহত্যা ও মানসিক রোগ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হচ্ছে আধ্যাত্মিক শূন্যতা। কুরআন মানুষকে তার স্রষ্টা, জীবন ও মৃত্যুর প্রকৃত উদ্দেশ্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। এই শিক্ষা অনুপস্থিত হলে মানুষ ভোগবাদী জীবনধারার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে।

৩.৪.২ কুরআন থেকে দূরে থাকার মানসিক প্রভাব: কুরআনি শিক্ষার অনুপস্থিতিতে মানুষের মধ্যে নিম্নোক্ত মানসিক সমস্যাগুলো দেখা দিতে পারে

হতাশা: জীবনের প্রতিকূলতা মোকাবেলায় কুরআন মানুষকে ধৈর্য, আশা এবং আল্লাহর উপর ভরসা করতে শিক্ষা দেয়।

আল্লাহ বলেন "নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে রয়েছে স্বস্তি।" (সূরা আশ-শারহ: ৬)

কিন্তু কুরআনি দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে মানুষ সাময়িক ব্যর্থতা বা দুঃখকে জীবনের শেষ পরিণতি মনে করে হতাশ হয়ে পড়ে।

উদ্বেগ ও ভয়: কুরআন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের শিক্ষা দেয়।

"যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট।" (সূরা আত-তালাক :৩)

কুরআন থেকে দূরে থাকা ব্যক্তি ভবিষ্যৎ নিয়ে অতিরিক্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে এবং মানসিক অস্থিরতায় ভোগে।

আত্মহত্যার প্রবণতা: বর্তমান বিশ্বে আত্মহত্যার অন্যতম কারণ হলো জীবনের অর্থ হারিয়ে ফেলা। কুরআন মানুষকে জীবনের প্রতিটি পরীক্ষার পেছনে আল্লাহর হিকমত রয়েছে বলে শিক্ষা দেয়। ফলে একজন মুমিন কঠিন পরিস্থিতিতেও আশাবাদী থাকে। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, উচ্চশিক্ষা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সত্ত্বেও বিশ্বজুড়ে মানসিক রোগের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের

অবক্ষয়। কুরআন মানুষকে আত্মিক স্থিতি, মানসিক ভারসাম্য এবং জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা প্রদান করে, যা মানসিক সুস্থতার জন্য অপরিহার্য।

৩.৪.৩ গুনাহকে তুচ্ছ মনে করাঃ আল্লাহ বলেন:

"অতঃপর তাদের পরে এমন উত্তরসূরি এলো যারা সালাত নষ্ট করল এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করল।" (সূরা মারইয়াম:৫৯)

এই আয়াতে আল্লাহ এমন একটি জাতির কথা উল্লেখ করেছেন যারা আল্লাহর নির্দেশনা উপেক্ষা করে নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছিল। এর ফলাফল ছিল নৈতিক অধঃপতন ও ধ্বংস। কুরআনের জ্ঞান না থাকলে পাপ ও পুণ্যের পার্থক্য অস্পষ্ট হয়ে যায়। তখন মানুষ মিথ্যা, প্রতারণা, সুদ, ঘুষ, ব্যভিচার ও অন্যায়কে স্বাভাবিক মনে করতে শুরু করে। কুরআন মানুষকে হালাল-হারাম, ন্যায়-অন্যায় এবং পাপ-পুণ্যের সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করে। কুরআনের শিক্ষা না থাকলে একজন ব্যক্তি তার কাজের নৈতিক মূল্যায়ন করতে পারে না।

ফলে ধীরে ধীরে নানারকম সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। যেমনঃ মিথ্যা বলা স্বাভাবিক হয়ে যায়, প্রতারণা বুদ্ধিমত্তা হিসেবে বিবেচিত হয়, সুদভিত্তিক লেনদেনকে অর্থনৈতিক প্রয়োজন মনে করা হয়, ঘুষকে সামাজিক রীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়, ব্যভিচারকে ব্যক্তিস্বাধীনতার অংশ হিসেবে দেখা হয়, ইত্যাদি।

৩.৪.৪ পাপকে স্বাভাবিকীকরণঃ সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন, যখন একটি সমাজে কোনো অন্যায় কাজ বারবার সংঘটিত হয়, তখন মানুষ সেটিকে স্বাভাবিক হিসেবে গ্রহণ করতে শুরু করে। কুরআনি শিক্ষা না থাকলে ব্যক্তির অন্তরে পাপবোধ কমে যায়। ফলে সে ধীরে ধীরে বড় গুনাহের প্রতিও উদাসীন হয়ে পড়ে।

হারিস ইবনু সুওয়াইদ (রহঃ) বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ (রাঃ) আমাকে দু'টো কথা বলেছেন- একটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে, আর অপরটি তাঁর নিজের পক্ষ থেকে। তিনি বলেছেন, মু'মিন নিজের গুনাহকে মনে করে সে যেন কোন পাহাড়ের নীচে বসে আছে, যা তার উপর ভেঙ্গে পড়ার আশঙ্কা করে। অপরদিকে গুনাহগার ব্যক্তি নিজের গুনাহকে দেখে একটি মাছির মতো, যা তার নাকের উপর বসল, আর তা সে হাত দিয়ে নাড়িয়ে তাড়িয়ে দিলো।

(সহীহ আল-বুখারী ৬৩০৮)

অন্যদিকে গুনাহকে তুচ্ছ মনে করা হৃদয়ের কঠোরতার লক্ষণ।

আত্মশুদ্ধির অভাবঃ কুরআন তওবা, আত্মসমালোচনা এবং আত্মশুদ্ধির শিক্ষা দেয়।
আল্লাহ বলেন—

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদের ভালোবাসেন।"

(সূরা আল-বাকারাহ, ২:২২২)

কিন্তু কুরআনি শিক্ষা থেকে দূরে থাকা ব্যক্তি নিজের ভুল উপলব্ধি করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

সামাজিক প্রভাবঃ ব্যক্তির গুনাহকে তুচ্ছ মনে করার প্রবণতা পরে সামাজিক রূপ ধারণ করে। এর ফলস্বরূপ, দুর্নীতি বৃদ্ধি পায়, পরিবার ভেঙে যায়, সামাজিক আস্থা নষ্ট হয়, অপরাধের হার বৃদ্ধি পায়। কুরআনি শিক্ষা মানুষকে পাপ সম্পর্কে সচেতন করে এবং আত্মসংযম শেখায়। এই শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন হলে ব্যক্তি গুনাহকে হালকা মনে করতে শুরু করে, যা তার নৈতিক অবক্ষয়ের সূচনা করে।

আল্লাহ বলেন:

"তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তারা তা দিয়ে বুঝে না।" (সূরা আল-আ'রাফ: ১৭৯)

কুরআন মানুষের বিবেককে জাগ্রত করে। কুরআন থেকে বিচ্ছিন্ন হলে বিবেক দুর্বল হয়ে পড়ে এবং নৈতিক বিচারক্ষমতা হ্রাস পায়।

৩.৫. 'সবর' বা ধৈর্যের শূন্যতা

কুরআনি শিক্ষার একটি বিশাল অংশজুড়ে রয়েছে 'সবর' বা ধৈর্য ধারণের তাগিদ। সবর মূলত তিন প্রকার: এক. আল্লাহর ইবাদত বা আনুগত্য পালনে কষ্ট সহ্য করার সবর; দুই. পাপকাজ বা অবাধ্যতা থেকে নিজেকে বিরত রাখার সবর; তিন. তাকদির বা আল্লাহর ফয়সালার ওপর সন্তুষ্ট থেকে বিপদে ধৈর্য ধারণ করা, যাতে ক্রোধান্বিত হতে না হয়।

হাদীসে উল্লেখ আছে,

"আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যের চেয়ে উৎকৃষ্ট এবং ব্যাপকতর দান কাউকে দেন নি।" (সুনান আবু দাউদ, অনুচ্ছেদ: নিষ্কলুষ থাকা। সহীহ)

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

“আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোন বিপদ আসে না। আর যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে তিনি তাঁর অন্তরকে সঠিক পথের সন্ধান দেন।” (সূরা তাগাবুনঃ ১১)

উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আলকামা বলেন, “আল্লাহ তায়ালা ‘যার অন্তরকে সঠিক পথের সন্ধান দেন’ সে হল ঐ ব্যক্তি যে বিপদে পড়লে বিশ্বাস করে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। ফলে বিপদে পড়েও সে খুশি থাকে এবং সহজভাবে তাকে গ্রহণ করে।”

জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে মুমিনের ধৈর্যের প্রয়োজন। আল্লাহর নির্দেশের সামনে ধৈর্যের প্রয়োজন। আল্লাহর পথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে ধৈর্যের প্রয়োজন। কারণ, এ পথে নামলে নানা ধরনের কষ্ট ও বিপদের মুখোমুখি হতে হবে। কুরআনি শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেলে মানুষের মনস্তত্ত্ব থেকে এই ত্রিবিধ ধৈর্যের ধারণাই বিলুপ্ত হয়ে যায়। ফলে সামান্য বিপদে মানুষ চরম হতাশায় ভোগে, উগ্র আচরণ করে এবং পাপকাজ থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করার মানসিক শক্তি হারিয়ে ফেলে। বর্তমান সমাজে আত্মহত্যার আধিক্য, ক্রোধের বশবর্তী হয়ে খুন বা সহিংসতার মূলে রয়েছে এই 'সবর'-এর অভাব।

৪. নৈতিক অবক্ষয় ও মানবতার স্থলন

শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো পাশবিক প্রবৃত্তি থেকে মানবতাকে মুক্ত করা এবং একটি সুশীল চরিত্র গঠন করা। ইসলামি শিক্ষা মানুষকে মানবিক মূল্যবোধ, সততা, দয়া এবং ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়।

বিবেক হলো মানুষের অন্তর্নিহিত নৈতিক শক্তি, যা তাকে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্ধারণে সাহায্য করে। কুরআন এই বিবেককে জাগ্রত ও পরিশুদ্ধ করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।

আল্লাহ বলেন,

"শপথ মানুষের নফসের এবং যিনি তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন, অতঃপর তাকে তার পাপ ও তাকওয়ার জ্ঞান দিয়েছেন।" (সূরা আশ-শামস: ৭-৮)

যারা পাশবিক প্রবৃত্তির কাছে আত্মসমর্পণ না করে আল্লাহ পাকের বিধান অনুযায়ী স্বভাবের কুৎসিত চাহিদাগুলো পরাভূত করে, জীবনের ক্ষেত্রে মহত্তম গুণাবলিকে বিজয়ী করে, তারাই প্রকৃত মানুষ। কিন্তু কুরআনি শিক্ষার অবর্তমানে ব্যক্তির চরিত্র তার সর্বনিম্ন স্তরে নেমে আসে।

৪.১. পশুর স্তরে অবনমন এবং আধ্যাত্মিক অন্ধত্ব

কুরআনি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত মানুষের নৈতিক স্থলন তাকে চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও অধম স্তরে নামিয়ে আনে। কারণ, চতুষ্পদ জন্তু তার স্বভাবজাত প্রবৃত্তি অনুযায়ী জীবনযাপন করে, কিন্তু মানুষ তার বিবেক ও বুদ্ধিমত্তা থাকা সত্ত্বেও যখন স্রষ্টার অবাধ্য হয়, তখন সে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে যায়। সূরা আল-আরাফে অত্যন্ত কঠিন ভাষায় বলা হয়েছে: "আমি তো বহু জিন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি; তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চোখ আছে তা দ্বারা তারা দেখে না এবং তাদের কান আছে তা দ্বারা তারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো; বরং তারা অধিক পথভ্রষ্ট। তারাই হচ্ছে গাফেল।" (সূরা আল-আরাফ: ১৭৯)।

এই আয়াতে আল্লাহ এমন মানুষদের কথা বলেছেন যারা সত্য উপলব্ধির ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা ব্যবহার করে না। এর ফলস্বরূপ তাদের বিবেক ও নৈতিক চেতনা নিস্তেজ হয়ে যায়।

নৈতিক চেতনার মৃত্যু ঘটলে মানুষের বিবেক কাজ করা বন্ধ করে দেয়। তখন চোখ থাকতেও তারা সমাজের অন্যায় ও জুলুম দেখতে পায় না, কান থাকতেও সত্যের ডাক ও মজলুমের আর্তনাদ তাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না। তাদের হৃদয় তাকওয়াশূন্য, জনমানবহীন মরুভূমির মতো হয়ে যায়, যেখানে কেবল পাপের স্তূপ জমে থাকে। এই আধ্যাত্মিক অন্ধত্বই ব্যক্তিচরিত্রের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি।

৪.২. উত্তম চরিত্রের আদর্শ থেকে বিচ্যুতি এবং সততার সংকট

নৈতিকতা গঠনে আল-কুরআনই হলো সর্বোত্তম মডেল। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা (রা.)-কে যখন মহানবী (সা.)-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তখন তিনি একবাক্যে উত্তর দিয়েছিলেন, "আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আখলাক তো ছিল কুরআন।" (সহীহ মুসলিম: ৭৪৬)।

সূরা আল-কালামে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন: "নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের ওপর অধিষ্ঠিত" (৬৮:৪)। এই মহান চরিত্রের ভিত্তি ছিল কুরআন।

আয়াতে উল্লেখিত, মহান চরিত্র" এর অর্থ নির্ধারণে কয়েকটি মত বর্ণিত আছে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, মহৎ চরিত্রের অর্থ মহৎ দ্বীন। কেননা, আল্লাহ তা'আলার কাছে ইসলাম অপেক্ষা অধিক প্রিয় কোনো দ্বীন নেই। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, স্বয়ং কুরআন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর "মহৎ চরিত্র"। অর্থাৎ কুরআন পাক যেসব উত্তম কর্ম ও চরিত্র শিক্ষা দেয়, তিনি সেসবের বাস্তব নমুনা। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "মহৎ চরিত্র" বলে কুরআনের শিষ্টাচার বোঝানো হয়েছে; অর্থাৎ যেসব শিষ্টাচার কুরআন শিক্ষা দিয়েছে। [কুরতুবী]

রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেও ঘোষণা করেছেন, "আমি উত্তম চরিত্রকে পূর্ণতা দান করার জন্যই প্রেরিত হয়েছি" (মুসনাদে আহমাদ)। সাহাবী হযরত আনাস (রা.) মহানবী (সা.)-এর এই কুরআনি চরিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, "আমি দশ বছর যাবৎ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে নিয়োজিত ছিলাম। আমার কোনো কাজ সম্পর্কে তিনি কখনো 'উহ!' শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করেননি। তিনি কখনো বলেননি, তুমি এ কাজ করলে কেন? বা এ কাজ করলে না কেন?"। [বুখারী: ৬০৩৮, মুসলিম: ২৩০৯]

কুরআনি শিক্ষার অভাব সমাজে সততা, বিশ্বস্ততা, সহনশীলতা ও দানশীলতার চরম সংকট তৈরি করে। কুরআন মানুষকে শেখায় নিভূতেও কীভাবে সৎ থাকতে হয়, কারণ

স্রষ্টা সবকিছু দেখছেন। এর একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় কাজী আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল বাকীর জীবনে। তিনি মক্কায় নিদারুণ ক্ষুধায় কাতর থাকা সত্ত্বেও পথে কুড়িয়ে পাওয়া একটি মহামূল্যবান মোতির হার প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। মালিক তাকে পাঁচশ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দিতে চাইলেও তিনি তা গ্রহণ করতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করে বলেছিলেন, "আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি মাত্র, এর কোনো বিনিময় আমি নেব না"। এই অভাবনীয় সততা কোনো মানবসৃষ্ট আইনের ভয়ে তৈরি হয়নি, বরং এটি ছিল কুরআনি শিক্ষার প্রত্যক্ষ ফসল। বর্তমানে কুরআনি শিক্ষার অভাবে সমাজে এই ধরনের সততা ও নৈতিকতার চরম আকাল দেখা যাচ্ছে। মানুষ সামান্য সুযোগ পেলেই অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করতে কুণ্ঠাবোধ করছে না।

৪.৩. আত্মপর্যালোচনা বর্জন

কুরআনি শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাওয়ার অন্যতম কুফল হলো নিজের আমল ও কাজের হিসাব নেওয়া বা আত্মপর্যালোচনা পরিত্যাগ করা। একজন কুরআন-বিচ্যুত ব্যক্তি কখনোই নিজের ভুল-ত্রুটি নিয়ে চিন্তা করে না। আত্মপর্যালোচনা বর্জনের ফলে মানুষ প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হয় এবং পাপ কাজ তার কাছে অত্যন্ত সহজ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। পরিণামে সে কোনো কাজের পরিণতি নিয়ে চিন্তা করে না, যা তাকে ইহকাল ও পরকালে নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

মানুষের বিবেকের অবক্ষয়ের ধাপসমূহ হলোঃ সত্যকে অবহেলা করা, পাপের প্রতি অভ্যস্ততা, এবং হৃদয়ের কঠোরতা

প্রথম ধাপ: সত্যকে অবহেলা করাঃ মানুষ যখন বারবার কুরআনের নির্দেশনা উপেক্ষা করে, তখন সত্যের প্রতি তার সংবেদনশীলতা কমে যায়।

দ্বিতীয় ধাপ: পাপের প্রতি অভ্যস্ততাঃ একই গুনাহ বারবার করতে করতে মানুষের অন্তর সেই পাপকে স্বাভাবিক হিসেবে গ্রহণ করে।

তৃতীয় ধাপ: হৃদয়ের কঠোরতাঃ আল্লাহ বলেন,

"এরপর তাদের হৃদয় কঠোর হয়ে গেল পাথরের মতো কিংবা তার চেয়েও কঠিন।"

(সূরা আল-বাকারাহ: ৭৪)

হৃদয় কঠোর হয়ে গেলে উপদেশ, নসিহত কিংবা সত্যের আহ্বান আর কার্যকর হয় না। বিবেকের অবক্ষয়ের বাস্তব চিত্র বর্তমান সমাজে আমরা দেখতে পাই।

আমরা দেখতে পাই, অন্যায় দেখেও মানুষ প্রতিবাদ করে না, মিথ্যা ও প্রতারণা সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে, দুর্নীতিকে দক্ষতা হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং অসহায় মানুষের অধিকার হরণকে অপরাধ মনে করা হয় না। এসবই বিবেকের অবক্ষয়ের লক্ষণ।

কুরআন মানুষকে বারবার আত্মসমালোচনার আহ্বান জানায়।

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যেন লক্ষ্য করে আগামীকালের জন্য সে কী প্রেরণ করেছে।" (সূরা আল-হাশর: ১৮)

এই আত্মসমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি বিবেককে জীবিত রাখে এবং নৈতিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা করে।

৫. পারিবারিক কাঠামোর ভাঙন ও অবক্ষয়

সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পরিবার হলো সমাজের ক্ষুদ্রতম, মৌলিক এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একক। পরিবারের সুস্থতা ও স্থিতিশীলতার ওপর নির্ভর করে গোটা সমাজের সুস্থতা। কুরআনি শিক্ষা পরিবারের প্রতিটি সদস্যের, পিতামাতা, সন্তান, স্বামী-স্ত্রী অধিকার, কর্তব্য এবং পারস্পরিক সম্পর্কের একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও ভালোবাসাপূর্ণ রূপরেখা প্রদান করে। এই ঐশী শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে বর্তমান বিশ্বে পারিবারিক জীবনে অতি দ্রুত অবক্ষয় এবং অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৫.১. পিতামাতার প্রতি অবহেলা ও পারিবারিক সহিংসতা

পারিবারিক অপরাধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নারী, শিশু ও গৃহকর্মী নির্যাতন, পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব অবহেলা, এবং সম্পত্তি বণ্টনে জটিলতা বা প্রতারণা। কুরআন যেখানে পিতামাতার সাথে অত্যন্ত নম্র আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছে এবং তাদের প্রতি বিরক্তিবাচক 'উফ' শব্দটিও উচ্চারণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে (সূরা আল-ইসরা: ২৩), সেখানে ধর্মীয় মূল্যবোধহীন সমাজে বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পিতামাতাকে বোঝা মনে করা, তাদের নিগৃহীত করা এবং সম্পত্তির লোভে নিজ ভাই-বোনকে ঠকানোর ঘটনা আজ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৫.২. দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি ও বিবাহ বিচ্ছেদ

কুরআন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে 'পরস্পরের পোশাক' (সূরা আল-বাকারা: ১৮৭) এবং প্রশান্তি, ভালোবাসা ও দয়ার আধার (সূরা আর-রুম: ২১) হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছে। পোশাক যেমন মানুষের নগ্নতা ঢেকে রাখে এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, স্বামী-স্ত্রীও তেমনি একে অপরের রক্ষক। কিন্তু কুরআনি শিক্ষার অবর্তমানে এবং বস্তুবাদী সভ্যতার প্রভাবে এই সম্পর্কগুলো এখন চরম স্বার্থকেন্দ্রিক, ঠুনকো এবং চুক্তিভিত্তিক হয়ে পড়েছে। পশ্চিমা বিশ্বের পাশাপাশি প্রাচ্যের দেশগুলোতেও ডিভোর্স বা বিবাহ বিচ্ছেদের হার বৃদ্ধি, দাম্পত্য কলহ, পরকীয়া এবং পারিবারিক ভাঙন, এসবই মূলত ঐশী বিধান থেকে

মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার সামাজিক ক্ষতি । পরিবারের এই ভাঙন ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এক চরম নিরাপত্তাহীনতা এবং মানসিক বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

৫.৩. জীবনসঙ্গী নির্বাচনে ধর্মানুরাগ বা 'দ্বীনদারি' উপেক্ষা

ইসলামি বিধানে স্বামী বা স্ত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাহ্যিক সৌন্দর্য, সম্পদ বা বংশমর্যাদার চেয়ে পাত্র বা পাত্রীর 'দ্বীনদারি' বা ধর্মানুরাগকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কুরআনি শিক্ষা বর্জনের কারণে আধুনিক সমাজ আজ দ্বীনদারির বদলে সম্পদ, ক্যারিয়ার ও মোহকে বিয়ের প্রধান মানদণ্ড বানাচ্ছে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আল্লাহভীতি থাকছে না এবং সংসারে শয়তানের প্ররোচনা বৃদ্ধি পেয়ে পারিবারিক কলহ, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের অভাব ও চূড়ান্ত পর্যায়ে বিচ্ছেদের সৃষ্টি হচ্ছে।

৬. সামাজিক সংকট, অর্থনৈতিক অনাচার ও বিশৃঙ্খলা

ব্যক্তি ও পরিবারের গণ্ডি পেরিয়ে কুরআনি শিক্ষার অভাব গোটা সমাজদেহকে এক দুরারোগ্য ব্যাধির মতো কলুষিত করে। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় নৈতিক অবক্ষয় চরম আকার ধারণ করেছে, যার মূলে রয়েছে ইসলামি ও নৈতিক শিক্ষার ভয়াবহ শূন্যতা।

৬.১. যুবসমাজের বিপথগামিতা, নির্লজ্জতা ও পাপাচার

যেকোনো সমাজের মূল চালিকাশক্তি হলো তার যুবসমাজ। কিন্তু ধর্মীয় শিক্ষার অভাবে মানুষ, বিশেষ করে যুবসমাজ সবচেয়ে বেশি বিপথগামী হচ্ছে। ইসলামী ও নৈতিক শিক্ষার অভাবে সামাজিক অবক্ষয় আজ চরম আকার ধারণ করেছে। অবাধ মেলামেশা, নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনা আজ মহামারীর রূপ ধারণ করেছে। বিজাতীয় কৃষ্টি ও বস্তুবাদী সভ্যতার উন্মাদনায় যুবসমাজ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছে, যার ফলে সন্তানেরা পিতা-মাতার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে সমাজে নারী ধর্ষণ, ইভটিজিং, টিজিং এবং যৌন হয়রানির মতো জঘন্য অপরাধ আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কুরআন পর্দার বিধান এবং দৃষ্টি অবনত রাখার যে শিক্ষা দিয়েছে, তা বর্জন করার ফলেই সমাজে পতিতাবৃত্তির মতো অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পতিতাবৃত্তি কেবল একটি ব্যক্তিগত পাপ নয়, বরং এটি সমগ্র মুসলিম সমাজের জন্য এক চরম সামাজিক ব্যর্থতা এবং নৈতিক অবক্ষয়ের লক্ষণ। জিহাদের চেতনা এবং সমাজ সংস্কারের দায়িত্ব ভুলে যাওয়ার কারণেই সমাজে এ ধরনের পঙ্কিলতা বাসা বাঁধে।

৬.২. অর্থনৈতিক অপরাধ, দুর্নীতি এবং সুদের অভিষাপ

সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, লুণ্ঠন, পণ্যে ভেজাল মিশ্রণ, ঘুষ এবং দুর্নীতির মতো অপরাধের ব্যাপকতা কুরআনি শিক্ষা বর্জনের প্রত্যক্ষ ফল। কুরআন সম্পদের সুষম বণ্টন, জাকাত ব্যবস্থা এবং হালাল উপার্জনের ওপর কঠোর নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি সুদকে (রিবা) সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল বলা হয়েছে (সূরা আল-বাকারা: ২৭৮-২৭৯)।

কিন্তু আখেরাতের জবাবদিহিতার অনুভূতি না থাকায় এবং বস্তুবাদী লালসা চরম আকার ধারণ করায় মানুষ যেকোনো উপায়ে সম্পদ কুক্ষিগত করতে চাইছে। সহীহ আকীদা থেকে বিচ্যুতির কারণেই সমাজে স্বার্থপরতা ও লুটেপুটে খাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, যা একটি ভারসাম্যপূর্ণ উত্তম সমাজকে অশান্ত, অস্থির, দুর্বল ও দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজে পরিণত করে।

মাদকাশক্তি বা মদ্যপান আরেকটি বড় সামাজিক ব্যাধি। সূরা আল-মায়িদাহ-তে আল্লাহ তাআলা মদকে 'শয়তানের কাজ' এবং অপবিত্র বলে ঘোষণা করে তা থেকে কঠোরভাবে বারণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) মদকে সর্বপ্রকার অপকর্ম এবং অশ্লীলতার জন্মদাতা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কুরআনি শিক্ষার অভাবে মদের অবাধ প্রবাহ সমাজে খুন, ধর্ষণ ও পারিবারিক সহিংসতার মাত্রাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিচ্ছে।

৬.৩. বর্ণবাদ, অহংকার ও সামাজিক সাম্যের বিনাশ

আল-কুরআনের সূরা হুজুরাতে (আয়াত: ১৩) আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে বিভিন্ন বর্ণ ও গোত্রে বিভক্ত করার মূল উদ্দেশ্য হিসেবে 'পারস্পরিক পরিচয়'-কে উল্লেখ করেছেন। ইসলামে জাতি, বর্ণ বা গোত্রের ভিত্তিতে কোনো মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের সুযোগ নেই। কিন্তু কুরআনি শিক্ষা ভুলে যাওয়ার কারণে সমাজে আজ উগ্র জাতীয়তাবাদ, আভিজাত্যের অহংকার এবং শ্রেণিবৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করেছে। মানুষ ঐশী মাপকাঠি তাকওয়া বা আল্লাহভীতির পরিবর্তে সম্পদ ও ক্ষমতার ভিত্তিতে অপর মানুষকে মূল্যায়ন করছে, যা সামাজিক ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের মূলে চরমভাবে কুঠারাঘাত করছে।

৬.৪. সামাজিক শিষ্টাচারের অভাব

কুরআন কেবল ইবাদতের নিয়মাবলিই দেয় না, বরং মানুষের দৈনন্দিন সামাজিক মেলামেশার শিষ্টাচারও শিক্ষা দেয়। সূরা হুজুরাতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তিনটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধিকে হারাম করা হয়েছে: ১) প্রবল বা অমূলক ধারণা পোষণ, ২) গোপন দোষ অনুসন্ধান করা বা গুপ্তচরবৃত্তি, এবং ৩) গীবত বা পরনিন্দা করা। কুরআনি শিক্ষার অভাব বর্তমান সমাজে এই তিনটি ব্যাধিকে মহামারীতে রূপ দিয়েছে। মানুষ সামান্য

কারণেই একে অপরের প্রতি অশুভ ধারণা পোষণ করছে, সাইবার বুলিং বা ব্যক্তিগত তথ্য হাতিয়ে নিয়ে গোপন দোষ খুঁজছে এবং প্রকাশ্যে গীবত করছে। এর ফলে মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক আস্থা, হৃদয়তা ও সামাজিক ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে একটি চরম বিষাক্ত ও বিদ্বেষপূর্ণ সমাজব্যবস্থা তৈরি হচ্ছে।

৭. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও বিচারিক স্থলন

কুরআনি শিক্ষার অভাব কেবল ব্যক্তি বা সমাজেই সীমাবদ্ধ থাকে না, এটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়। বিচারব্যবস্থা, শাসনযন্ত্র এবং রাজনীতিকেও গভীরভাবে কলুষিত করে। একটি স্বাধীন ও ন্যায়বিচারভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ঐশী আইনের বিকল্প নেই।

৭.১. কুরআনিক বিধানের পরিবর্তে মানবসৃষ্ট বিধানের অন্ধ অনুসরণ

সমাজ সংস্কার এবং রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য আল্লাহ তাআলা আল-কুরআনে সুস্পষ্ট বিধান দিয়েছেন। সূরা আল-মায়িদাহ-তে মহান আল্লাহ রাসূল (সা.)-কে উদ্দেশ্য করে এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল বিচারক ও শাসকদের সতর্ক করে বলেছেন:

"এবং (আমি আদেশ করছি যে,) তুমি মানুষের মধ্যে সেই বিধান অনুসারেই বিচার করবে, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবে না। তাদের ব্যাপারে সাবধান থেকে, পাছে তারা তোমাকে এমন কোনো বিধান থেকে বিচ্যুত করে, যা আল্লাহ তোমার প্রতি নাযিল করেছেন... তাদের মধ্যে অনেকেই ফাসিক।" (সূরা আল-মায়িদাহ, ৪৯-৫০)।

যখন সমাজের নেতৃবৃন্দ, আইনপ্রণেতা এবং বিচারকরা কুরআনের শাস্ত বিধান পরিত্যাগ করে মানুষের খেয়াল-খুশি ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তখন সমাজে ন্যায়বিচার সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়। কুরআনের ভাষায়, এরাই হলো 'ফাসিক' বা পাপাচারী (৫:৪৯)। ন্যায়বিচারের অভাবে সমাজে শ্রেণিবৈষম্য, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং নিপীড়ন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। দুর্বলরা বিচার পায় না, আর সবলেরা আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে বেরিয়ে যায়।

৭.২. নেতৃত্ব ও আকীদার চরম সংকট

সমাজ গঠনের প্রধান লক্ষ্য হলো সকল নাগরিকের সার্বিক কল্যাণ সাধন ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিতকরণ। কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে যখন অজ্ঞতা, কুশিক্ষা ও স্বার্থপরতা দেখা দেয়, তখন তা সমাজজীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। শাসন, নির্দেশ, তাকদীর ও আইন প্রণয়নে আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতাকে স্বীকার করে নেওয়া ইসলামি আকীদার অবিচ্ছেদ্য অংশ। যখন এই আকীদা থেকে রাষ্ট্র সরে আসে, তখন দুর্নীতি, বৈষম্য, বিভক্তি এবং হানাহানি রাষ্ট্রযন্ত্রকে গ্রাস করে ফেলে।

৮ কুরআনি শিক্ষা ও নৈতিকতা থেকে বিচ্যুত হওয়া সমাজের পতন

কুরআনি শিক্ষা ও নৈতিকতা থেকে বিচ্যুত হওয়ার বৃহত্তর পরাবাস্তব পরিণতি হলো আস্ত সমাজের পতন। একটি সমাজ বা রাষ্ট্র গঠিত হয় প্রবল সামাজিক ঐক্যের ওপর ভিত্তি করে, যার পেছনে ধর্ম ও নৈতিকতার ভূমিকা অনস্বীকার্য। যখন কোনো রাষ্ট্র বা সমাজের উচ্চবিত্ত এলিট শ্রেণি বিলাসিতা, দুর্নীতি ও অতিরিক্ত কর আরোপে মেতে ওঠে এবং উৎপাদন ও নৈতিকতা থেকে দূরে সরে যায়, তখন সেই সমাজের সামাজিক ঐক্যে দুর্বল হতে থাকে। রাষ্ট্র যখন নিজ স্বার্থে ধর্মকে কেবল রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে কিন্তু অন্তরে বা রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে এর আদর্শ ধারণ করে না, তখন থেকেই সমাজ ও সভ্যতার পতন শুরু হয়।

দীর্ঘমেয়াদি সমৃদ্ধি কেবল প্রযুক্তি, সামরিক শক্তি বা অর্থনৈতিক নীতির ওপর নির্ভর করে না; বরং এটি মানুষের আচরণ, বিশ্বাস এবং নৈতিক পূর্ণতার ওপর নির্ভরশীল। কুরআনি শিক্ষা বর্জনের ফলে সমাজে যখন স্বার্থপরতা ও ভোগবাদিতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, তখন সামাজিক সংহতি বিনষ্ট হয়। মানুষ একে অপরের প্রতি সহানুভূতি হারায়, এবং শেষ পর্যন্ত সেই সভ্যতা অন্তর্কলহ বা বহিঃশত্রুর আক্রমণে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়।

এই ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক সত্যটি ১৪০০ বছর আগেই মহানবী (সা.) একটি অমোঘ বাণীর মাধ্যমে ঘোষণা করেছিলেন:

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা এ কিতাব দ্বারা অনেক জাতিকে মর্যাদায় উন্নীত করেন আর অন্যদের অবনত করেন। অর্থাৎ যারা এ কিতাবের অনুসারী হবে তারা দুনিয়ায় মর্যাদাবান এবং আখিরাতে জাহ্নাম লাভ করবে। আর যারা একে অস্বীকার করবে তারা দুনিয়ায় লাঞ্চিত পরকালে জাহান্নামে পতিত হবে।" (সহীহ মুসলিম: ৮১৭)।

যতদিন মুসলিমরা কুরআনের শিক্ষাকে আঁকড়ে ধরেছিল, তারা জ্ঞান-বিজ্ঞান, ন্যায়বিচার, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে সমগ্র বিশ্বের নেতৃত্ব দিয়েছিল। আর যখনই তারা এই পবিত্র গ্রন্থকে কেবল আনুষ্ঠানিকতার বস্তুতে পরিণত করল এবং বাস্তব জীবন, রাষ্ট্র ও সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখল, তখনই তাদের ওপর নেমে এল লাঞ্ছনা ও অবমাননা।

৯ কুরআনি শিক্ষাভিত্তিক সমাজ বনাম কুরআন-বিচ্যুত সমাজ

উপরে উল্লিখিত তাত্ত্বিক আলোচনা এবং সমাজবাস্তবতার আলোকে একটি কুরআনি শিক্ষায় আলোকিত সমাজ এবং একটি কুরআন-বিচ্যুত (বস্তুবাদী) সমাজের মধ্যে একটি তুলনামূলক চিত্র নিচে উপস্থাপন করা হলো:

তুলনার প্রেক্ষাপট	কুরআনি শিক্ষায় আলোকিত সমাজ	কুরআন-বিচ্যুত (বস্তুবাদী) সমাজ
মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা	অল্পে তুষ্টি, তাওয়াক্কুল , আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা এবং অন্তরের চরম প্রশান্তি। পার্থিব ক্ষতিতেও অবিচল থাকা।	জীবন-সংকীর্ণতা, হতাশা, ডিপ্রেশন, মাত্রাতিরিক্ত উদ্বেগ এবং আত্মহত্যার প্রবণতা।
নৈতিক মানদণ্ড	আখেরাতের জবাবদিহিতার অনুভূতি, সততা, সহমর্মিতা এবং নিঃস্বার্থ পরোপকার।	স্বার্থপরতা, ভোগবাদিতা, প্রতারণা এবং পাশবিক প্রবৃত্তির কাছে আত্মসমর্পণ।
পারিবারিক কাঠামো	পিতামাতার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, দাম্পত্য জীবনে বিশ্বস্ততা এবং সুদৃঢ় পারিবারিক বন্ধন।	বিবাহ বিচ্ছেদ, পারিবারিক সহিংসতা, বৃদ্ধাশ্রমের বিস্তার এবং পারস্পরিক সম্পর্কের চূড়ান্ত অবক্ষয়।
সামাজিক সংহতি	ভ্রাতৃত্ববোধ, সামাজিক সুবিচার, হালাল উপার্জনের প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকার এবং নারীর সম্মান সুরক্ষা।	শ্রেণিবৈষম্য, অবাধ মেলামেশা, দুর্নীতি, সুদ, ঘুষ, ও জঘন্য অপরাধের প্রসার।
রাষ্ট্র ও সভ্যতা	সুদৃঢ় সংহতি, ন্যায়বিচারভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং একটি কল্যাণকামী সভ্যতা।	অভিজাত শ্রেণির লাগামহীন দুর্নীতি, রাজনৈতিক

		অস্থিতিশীলতা এবং সভ্যতার অবশ্যম্ভাবী পতন।
--	--	--

এই তুলনামূলক বিশ্লেষণ থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, মানবসমাজের যেকোনো স্তরের প্রকৃত উন্নয়ন, মানসিক শান্তি এবং সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য কুরআনি শিক্ষার কোনো বাস্তবসম্মত বিকল্প নেই।

১০. কুরআনিক শিক্ষার আলোকে উত্তরণের উপায়

সমাজদেহ থেকে এই সর্বব্যাপী অবক্ষয় দূর করে একটি সুস্থ, সুন্দর, কল্যাণকামী ও নৈতিকতাভিত্তিক সভ্যতা বিনির্মাণের জন্য পুনরায় কুরআনের শিক্ষার দিকে পূর্ণাঙ্গভাবে ফিরে যাওয়া অপরিহার্য। সমাজ সংস্কারে ব্রতী হয়ে নিম্নোক্ত কার্যকর পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা আশু প্রয়োজন:

শিক্ষাক্রমে কুরআনিক ও নৈতিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি: জাতীয় শিক্ষানীতিতে বারবার নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকার করা হয়েছে। ছোট বেলা থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রমে ‘ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা’ বিভাগ সচল রাখা প্রয়োজন। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভেদাভেদ দূর করতে অন্যান্য ধর্ম ও মানবিক মূল্যবোধ শেখানোর নিয়ম চালু করতে হবে। স্কুল থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে ঐশী মূল্যবোধ চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা থাকতে হবে। শুধুমাত্র আক্ষরিক বা কারিগরি জ্ঞান নয়, বরং শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও আত্মিক বিকাশের জন্য সরকারি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে কুরআনি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও যুগোপযোগী করে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

হাজরুল কুরআন' থেকে সমাজের মুক্তি: কুরআনিক শিক্ষা বর্জন থেকে ব্যক্তি ও সমাজকে মুক্ত করতে হবে। কুরআনকে কেবল বরকত লাভের উদ্দেশ্যে তিলাওয়াতের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, এর অর্থ অনুধাবন, তাফসীর গবেষণা এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যক্তি, পরিবার ও রাষ্ট্রে এর বিধানের প্রায়োগিক বাস্তবায়নের ওপর সর্বোচ্চ জোর দিতে হবে।

মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন ও প্রতিপালন: মাদ্রাসা শিক্ষার কাঠামো পুনর্গঠন করে ধর্মীয় ও সাধারণ শিক্ষার সমন্বয় বৃদ্ধি করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, পাকিস্তান-স্থলে আলিয়ার মতো মডেল চালু করে মাদ্রাসা অধ্যয়নকে আধুনিক পরিপ্রেক্ষিতে দিতে হবে। শিক্ষাদান পদ্ধতিতে তিলাওয়াতের পাশাপাশি অর্থবোধ ও সমালোচনামূলক চিন্তার উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া সকল মাদ্রাসাকে একক শিক্ষাবোর্ডের আওতায় এনে নিয়মতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ও পাঠ্যক্রম ম্যানেজমেন্ট করতে হবে।

পারিবারিক মূল্যবোধ জাগ্রতকরণ ও শিশু গঠন: পরিবার হলো নৈতিকতা শিক্ষার প্রথম পাঠশালা। শিশুদের ছোটবেলা থেকেই কুরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। অভিভাবককে নিশ্চিত করতে হবে যে তাদের সন্তানরা যেন হালাল-হারামের পার্থক্য বুঝতে শেখে, যাতে তারা পরবর্তী জীবনে যেকোনো পরিস্থিতিতে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং আল্লাহর পথে অটল থাকে।

শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও সম্পদ বৃদ্ধি: কুরআন শিক্ষক ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের আধুনিক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা প্রযুক্তি সরবরাহ করতে হবে। সরকারি সহায়তায় নতুন শিক্ষকের জন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। উদ্ভাবনী শিক্ষাপদ্ধতি প্রয়োগ করে কুরআন শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করতে হবে।

সঠিক আকীদার প্রসার ও দুর্নীতি দমন: সমাজ থেকে স্বার্থপরতা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও লুটপাটের প্রবণতা দূর করতে সঠিক ইসলামি আকীদার প্রসার ঘটাতে হবে। কারণ সঠিক আকীদাই মানুষকে আখেরাতের জবাবদিহিতার কথা প্রতিনিয়ত স্মরণ করিয়ে দেয় এবং সকল প্রকার দুর্নীতি, সুদ ও ঘুষ থেকে বিরত রাখে।

গণমাধ্যম ও প্রযুক্তির ইতিবাচক ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার: শয়তানের প্ররোচনা এবং বিজাতীয় কৃষ্টির অন্ধ অনুকরণ রোধ করতে গণমাধ্যমগুলোকে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ প্রচারে বাধ্য করতে হবে। যে সকল অপসংস্কৃতি, বেহায়াপনা এবং অশ্লীলতা যুবক-যুবতীদের বিপথগামী করছে, রাষ্ট্রীয়ভাবে তার লাগাম টেনে ধরতে হবে।

সামাজিক সচেতনতা ও জনসংযোগ: কুরআন শিক্ষার সামাজিক গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে গণমাধ্যম ও সামাজিক উদ্যোগ নেওয়া উচিত। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ সব শ্রেণির লোকজনকে বিষয়ভিত্তিক অংশগ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে। এতে করে ধর্মনিরপেক্ষ মানসিকতা বৃদ্ধি পাবে এবং কুরআন শিক্ষাকে জীবনধারা হিসেবে গ্রহণ করা সহজ হবে।

গবেষণা এবং পরিসংখ্যান উন্নয়ন: ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিকতার সমাজে প্রভাব নিয়ে আরও পরিসংখ্যান ভিত্তিক গবেষণা প্রয়োজন। শিক্ষানীতি প্রস্তুতিতে তথ্যসমৃদ্ধ প্রমাণের দরকার, তাই সরকারি সংস্থা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় এ বিষয়ে নিবিড় অধ্যয়ন চালিয়ে যেতে হবে।

১১ উপসংহার

সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ ও চূড়ান্ত নিয়ামত হলো আল-কুরআন। এটি কেবল একটি গতানুগতিক ধর্মীয় গ্রন্থ বা আচারের সমষ্টি নয়, বরং এটি মানবজীবনের প্রতিটি দিকের এক অনন্য, পূর্ণাঙ্গ এবং নিখুঁত সংবিধান। এই গ্রন্থটি মানুষকে যেমন আত্মার পরিশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক পথের দিশা দেয়, ঠিক তেমনি বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজবিদ্যা, অর্থনীতি এবং রাষ্ট্র পরিচালনার মতো পার্থিব জীবন পরিচালনার সঠিক রূপরেখাও সুস্পষ্টভাবে প্রদান করে।

বর্তমান বিশ্বে, বিশেষ করে মুসলিম সমাজে যে ভয়াবহ নৈতিক, পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবক্ষয় আমরা প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করছি, তার শেকড় গভীরভাবে প্রোথিত রয়েছে কুরআনি শিক্ষা থেকে যোজন যোজন দূরে সরে যাওয়ার মধ্যে। আল্লাহ তাআলার স্মরণ ও তাঁর দেওয়া বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কারণে মানুষের মনস্তত্ত্ব আজ চরমভাবে বিপর্যস্ত, জীবন হয়ে উঠেছে দুর্বিষহ ও সংকীর্ণ। আল-কুরআনের অকাট্য ঘোষণা যা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান, তা হলো ধর্মীয় ও নৈতিক ভিত্তির অনুপস্থিতি কেবল ব্যক্তি বা নির্দিষ্ট কোনো সমাজকেই ধ্বংস করে না, বরং এটি আস্ত একটি সভ্যতার পতন ডেকে আনে।

পরিশেষে, দুনিয়ার জীবনে কাক্ষিত শান্তি, স্থিতিশীলতা আনয়ন এবং আখেরাতে চূড়ান্ত মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় হলো কুরআনের আলোয় নিজেদের জীবনকে নতুন করে ঢেলে সাজানো। সমাজ সংস্কারে আজ প্রয়োজন এমন এক মানসিকতার, যা কুরআনকে কেবল ভক্তিভরে রেশমি কাপড়ে মুড়িয়ে তাকের ওপর তুলে না রেখে, জীবনের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে ধারণ করবে এবং বাস্তবায়ন করবে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর সুমহান চারিত্রিক আদর্শ এবং কুরআনের শাস্ত্রত বিধানই কেবল পারে পথভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত মানবতাকে পুনরায় তার হৃত মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করতে। কারণ, আল্লাহর অমোঘ বাণী ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এটাই যে, তিনি এই কিতাবের মাধ্যমেই জাতিকে সম্মানিত করেন এবং এর বর্জনের মাধ্যমেই জাতিকে লাঞ্চিত করেন। সার্বিকভাবে, কুরআন শিক্ষা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত আত্মশুদ্ধির মাধ্যম নয়, এটি সামাজিক স্থিতিশীলতার বুনিয়াদ। এর অভাব সমাজে মূল্যবোধের শূন্যতা ও বিভাজন সৃষ্টি করে। পরিপূর্ণ এবং সময়োপযোগী কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা ছাড়া ব্যক্তিগত চরিত্র এবং

সামাজিক মর্যাদার অবক্ষয় অনিবার্য হবে। সুতরাং, ব্যক্তিগত আত্মশুদ্ধি থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রতিটি স্তরে কুরআনি শিক্ষার পুনর্জাগরণ ব্যতিরেকে এই ধ্বংসাত্মক নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের করাল গ্রাস থেকে মুক্তির আর কোনো বিকল্প পথ নেই।

মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের কুরআনিক শিক্ষা পরিপূর্ণভাবে জানার এবং সেই অনুযায়ী আমল করার ও জীবন পরিচালনা করার তৌফিক দান করুন। আমিন।